বাংলাদেশের সুভাস বোসঃ তাজউদ্দিন আহমেদ

-বিপ্লব

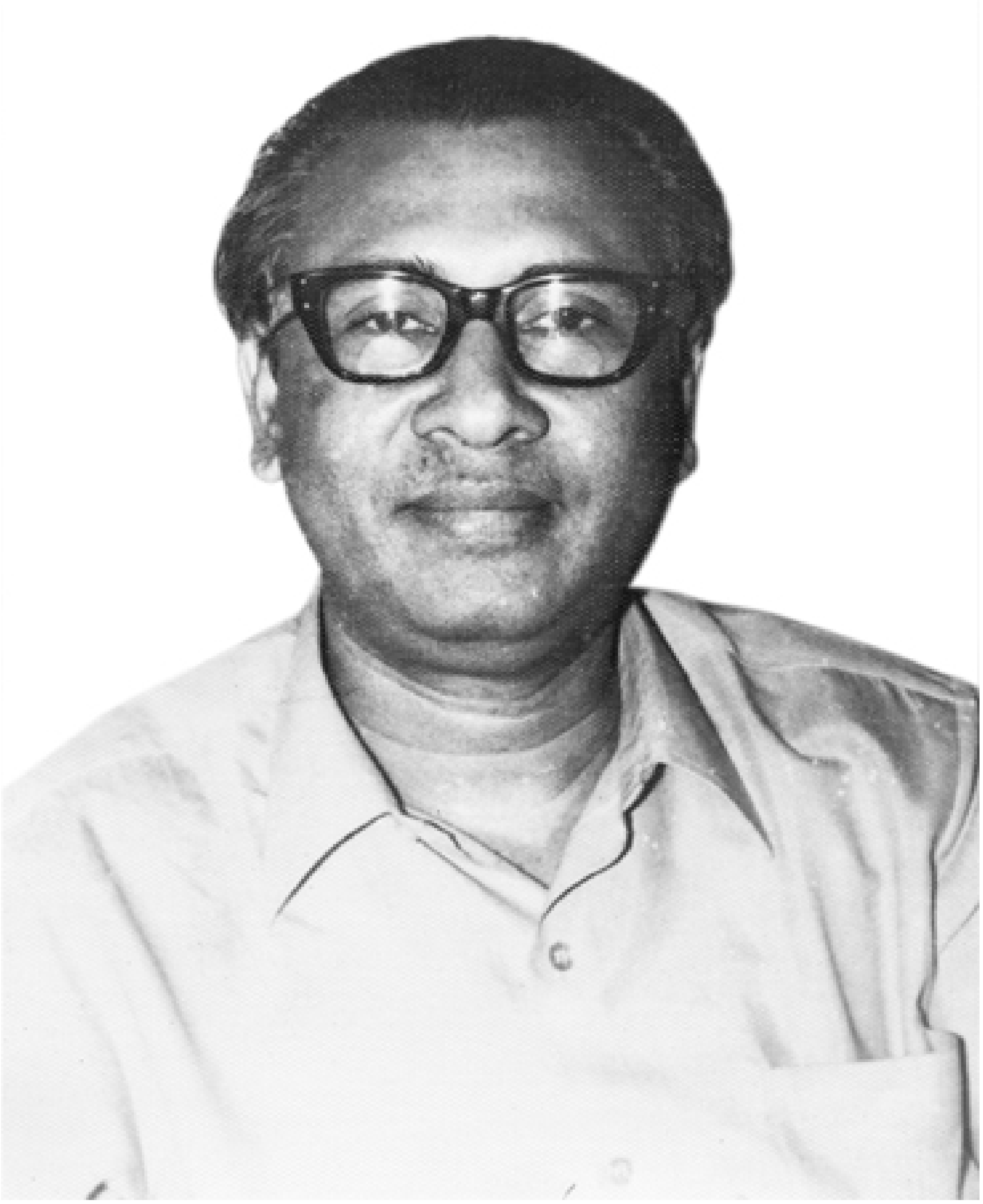

(তাজউদ্দিন কন্যা শারমিন আহমেদ রীপির সাথে কথোপকপনের ওপর ভিত্তি করে লেখা-)

যে বিস্ফোরক সংকটকালের মধ্যে আজকের বাংলাদেশ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বেয়নেট নাচন ঢাকার রাজপথে, আমি নিশ্চিত '৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং মুজিবনগর সরকারের সফল রূপকার তাজউদ্দিন আহমেদ যখন ঢাকায় ফিরছিলেন, তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি, তার পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরেপেক্ষ বাংলাদেশের শবের ওপর তার চরম শত্রুরাই আবার পূর্বপাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা করবে! হয়তো আন্দাজ পাচ্ছিলেন '৭৪ সাল থেকে-শেখ মুজিবের ক্যাবিনেট থেকে যেদিন তিনি ইস্তফা দিলেন (মতান্তরে শেখ মুজিব তাকে তাড়িয়েছিলেন-ধরা যাক উভয় তথ্যেই

কিছু সত্য আছে), তখন তিনি নিশ্চিত তার প্রাণের প্রিয় মুজিব ভাইকে ঘিরে রয়েছে কিছু চাটুকাররা। এবং তাদের মধ্যে রয়েছে খন্দকার মোস্তাকের মতন পাকিস্থানপন্থী কালসাপেরাও! ফলে বাকশালের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যাকরার সময় মুজিবকে তিনি খুব স্পষ্ট করেই ভবিষ্যতদ্রষ্টার মতন বলেছিলেন-মুজিব ভাই!তোমাকে জনগণতো আর গণতান্ত্রিক উপায়ে সরাতে পারবে না। ফলে বন্দুকের গুলি শুধু তোমাকে নয়, আমাদের সবাইকে সরাবে! গনতন্ত্রের প্রতি এতটাই নিষ্টাবান ছিলেন তাজউদ্দিন-কিন্ত শিক্ষার অভাব বা চাটুকারদের জন্য যা মুজিবের মধ্যে ঢোকাতে ব্যর্থ হন তিনি।

তাজুদ্দিন কন্যা শারমিন রীপির সাথে তেশরা নভেম্বর কথা হচ্ছিল লস এঞ্জেলেসের স্থানীয় আউয়ামী লিগ সেক্রেটারী বাদলের ঘরে। ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য এবং সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদের মোহমুগ্ধ করে শোনাচ্ছিলেন তেশরা নভেম্বরের জেলহত্যাদিবসের অজানা কথা। আমি পরে সেই ব্যাপারে আরো বিশদ লিখবো-আপাতত পাঠকদের জানানো যাক মুখ ঢাকা হত্যাকারীদের সংখ্যা ছিল চার। জেলর ঢুকতে দিতে চান নি-স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে ফোন আসে, ওদের ঢুকতে দাও। হ্যাঁ খন্দকার মুস্তাকের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই সেদিন ঘাতকরা মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ চার নেতাকে হত্যা করেন। অন্যবারের মতন এবারও তাজউদ্দিনের তৃতীয় নয়ন স্বচক্ষে দেখেছিল তার ভবিষ্যত-তিনি কামরুনজাম্মানকে বলেন আর সময় নেই। এবার শেষ নামাজ আদায় করি সবাই। তাজুদ্দিন জেলের রান্না খেতেন না-স্ত্রীর হাতের রান্না খেতেন। তার শেষ খাওয়া আর সম্পূর্ণ হয় নি-তার আগেই খন্দকার মুস্তাকের ঘাতক বাহিনী ষাট রাউন্ড গুলি চালায় সেমি অটোমেটিক রাইফেল থেকে। হাতের খাবার ছড়িয়ে পড়ে জেলের মেঝেতে। নেহেরুর মতন যিনি বাংলাদেশের নব রূপকার হতে পারতেন-খন্দকার মুস্তাকের সাথে তার দুইদশক ব্যাপী শত্রুতা, বা বলা যায় স্বাধীন বাংলাদেশে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ন খলনায়করা শুধু তাকেই হত্যা করেন নি। হত্যা করেছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে। মুজিবের বিরুদ্ধেতো না হয় অনেক লোকের রাগ ছিল-কিন্ত তাজউদ্দিনের মতন ব্যক্তিত্বকে যিনি বাকশালের বিরুদ্ধে ছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে সফল ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে খুন করতে নির্দেশ দেওয়ার অনেকে থাকতে পারে- কিন্ত আদেশ পালন করার মতন লোক '৭৫ সালে পাওয়া গেল কোথা থেকে? তাহলে কি ধরে নেবো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধি চেতনা গ্রাসরুটে প্রথম দিন থেকেই ছিল-মুজিবের বাকশালে সেই তৃণই মহীরূহ হয়ে ওঠে, যেমনটা তাজ উদ্দিন ভেবেছিলেন? ভারতের সাথে বন্ধুত্বই কি এর কারণ? তাজ উদ্দিন কিন্তু ভারতের সাথে সমস্ত চুক্তিতে বাংলাদেশের মাথা উঁচু রেখেছিলেন এবং জেনারেল মানেকশ থেকে ইন্দিরা সবাই স্বীকার করতেন তাজউদ্দিনের আত্মমর্যাদার ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়। এবং একবারের জন্যও কোন চুক্তিতে বাংলাদেশকে মাথা নিচু করতে দেন নি-ভারতীয় ফৌজ কবে বাংলাদেশ ছাড়বে, সেসব পর্যন্ত তিনি আগে থেকে চুক্তি করে নেন। ভারতের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করেছেন বলে তাকে যখন পাকিস্থানপন্থীরা ভারতের চর বলে আখ্যা দেয়,আমি ভাবি ধর্মের বিভাজনকে হাতিয়ার করে ইতিহাসকে বিকৃত করা কি সহজ! অথচ তাজউদ্দিন ছিলেন আদ্যপান্ত শৃঙ্খলাপরায়ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বরং খন্দকার মুস্তাকের রঙীন জীবনের অনেক খবরই আজ গোপন নয়। অথচ তাজউদ্দিন হয়ে উঠলেন ইসলামিক রাজনৈতিক শক্তির শত্রু আর খন্দকার তাদের অভীষ্ট নেতা! প্রকৃত ধার্মিক মানুষকে ভালোবাসে বলে তার রাজনৈতিক মুল্য ধর্মের ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণাত্মক-তাদের দরকার খন্দকার মুস্তাক বা জিন্নার মতন নেতা যারা ব্যক্তিগত জীবনে খলধার্মিক । কিন্তু ধর্মের নামে ঘৃণা এবং উন্মাদনা সৃষ্টিতে পারঙ্গাম। কারণ রাজনীতিতে ঘৃণার মূল্য আছে-ভালোবাসা সেখানে সতীনপুত্র!

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ এবং ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, তাজউদ্দিনের অভাব আরো বেশী অনূভুত হয়। নেহেরুর পাশে ছিলেন সর্দার প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশের মতন ব্যক্তিত্ব-যারা প্রতিটা মুহুর্ত্বে ভারতের নবরূপের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয়টা হলো

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ছয়দফা দাবী সহ আউয়ামী লিগের আন্দোলনের প্রতিটা ধাপ ছকেছেন তাজউদ্দিন। অথচ স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে মুজিবের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অটুট থাকলেও মুজিব ক্রমশ দূরে সরে গেলেন সেই মানুষটির কাছ থেকে, যাকে তার সবথেকে বেশী প্রয়োজন ছিল। নেহেরুর মতন পান্ডিত্য মুজিবের ছিল না-তিনি সেই অর্থে তৃণমুল থেকে ওঠা জনগণের নেতা। একটা সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন ক্ষমতা বা বুদ্ধি তার কোনটাই ছিল না। তাজউদ্দিনের মুজিবনগর সরকারের নিখুঁত প্ল্যানিং এর সাথে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সরকারের ব্যর্থতা এবং দুর্ভিক্ষ কিছু অপ্রিয় সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

শেখ মুজীব স্বাধীনতার জনক হিসাবে যতটাই অনন্য, স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা কি তার ছিল? কুদ্দুস খান সহ আরো অনেকে যারা তার অধীনে কাজ করেছেন তারা সব্বাই আমায় বলেছেন প্রশাসনিক কোন দক্ষতাই মুজিবের ছিল না। অনেকটা আমিই দেশের রাজা, আমার কথাই আইন, এই ঢঙেই রাজ্যপাট সামলাতেন শেখ মুজিব। কোন ব্যাপারে পরিকল্পনার ধারে কাছে ছিলেন না তিনি-কোন মিটিং য়ে তার যা মাথাই আসতো সেটাই হত সিদ্ধান্ত! খুব স্বাভাবিক যে বাংলাদেশের প্রশাসন, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দাবাহিনী, অর্থনীতি-বা কোন নীতিই এমন ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এটা প্রমানিত মুজিব প্রশাসন ব্যর্থতা এবং মোহভঙ্গের ইতিহাস। এমন অগনতান্ত্রিক প্রশাসনিক দৃষ্টিভংগী তাজউদ্দিন-মুজিব বিচ্ছেদের মূল কারণ। পাশাপাশি এক সফল গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রূপায়নের ইতি।

তাজউদ্দিন আমার কাছে বাংলাদেশের নেতাজী সুভাষ বোস। আমরা অনেকেই মনে করি নেতাজির হাতে জাতির নেতৃত্ব থাকলে ভারত আরো অনেক দিন আগে থেকেই বিশ্বমানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াত। তাজউদ্দিনের ওপর বেশ কিছু পড়াশোনা করার পর-আমার একই উপলব্ধি। তিনিই বাংলাদেশের সেই অধরা স্বপ্ন যার হাতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব থাকলে আজ কুকুর-শকুনের দল বাংলাদেশের শব ভক্ষন করতো না। তিনিই স্বাধীন বাঙলাদেশের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নায়ক এবং মহানায়ক।

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/১২/০৬